BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03080030

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 08| August 2025| e-ISSN: 2584-1890

পরিবেশ শিক্ষা: এসডিজি বাস্তবায়নের শক্তিশালী চালিকা শক্তি

Mahadeb Nandi

Email: mahadeb.nandi1991@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নলক্ষ্যসমূহ (Sustainable Development Goals—SDGs) বাস্তবায়নে পরিবেশ শিক্ষা একটি মৌলিক, আন্তঃসম্পর্কিত ও দীর্ঘস্থায়ী চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশ শিক্ষা শুধু প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান সরবরাহ করে না; এটি সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মূল্যবোধ, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা ও নাগরিক অংশগ্রহণকে সুসংগঠিত করে টেকসই আচরণ গড়ে তোলে। আধুনিক উন্নয়ন কাঠামো যথোপযুক্ত অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শক্তি, নগরায়ণ ও প্রযুক্তি—সবক্ষেত্রে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন এমন এক নাগরিক সমাজ, যারা সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু অভিযোজন এবং দায়িত্বশীলতার ভোগ-উৎপাদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই প্রবন্ধে পরিবেশ শিক্ষার ধারণাগত ভিত্তি, দার্শনিক ও নৈতিক উপাদান, শিক্ষণ-কৌশল, SDG-এর বিভিন্ন লক্ষ্যের সাথে এর সমন্বয়, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশ—যেমন বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও সামাজিক বাধাসহ বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে AI, IoT, স্মার্ট অনস্বীকায কৃষি, নবায়নযোগ্য শক্তি ও স্মার্ট নগর ধারণার বিস্তারের ফলে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান। সব মিলিয়ে, SDG অর্জন ও ভবিষ্যৎ স্থিতিশীল মানবসভ্যতা নির্মাণে পরিবেশ শিক্ষা একটি অপরিহার্য ও দৃঢ় ভিত্তি।

মূল শব্দ: *পরিবেশ শিক্ষা, স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs), আচরণগত পরিবর্তন, জলবায়ু অভিযোজন, স্থিতিশীল সমাজ।*

ভূমিকা:

২১শ শতাব্দীর বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামো এমন এক জটিল পরিবেশগত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, যেখানে কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধাই মানবসমাজকে নিরাপদ ভবিষ্যৎ দিতে যথেষ্ট নয়। পরিবর্তিত জলবায়ু, দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, সম্পদের অতিঅপব্যবহার এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ঘাটতি আমাদের জীবনব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। এ কারণে আধুনিক উন্নয়নের ভিত্তিমূলে পরিবেশগত জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে উন্নয়ন স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তি হওয়া সম্ভব নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় অঞ্চল ক্ষয়, অতিবৃষ্টি ও খরা বৃদ্ধির মতো চরম আবহিক ঘটনাবলি বিশ্বব্যাপী কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, জল, স্বাস্থ্য এবং অভিবাসন ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এর পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য হ্রাসের ফলে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে খাদ্যচক্র, পরাগায়ন, বনজ সম্পদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর। শিল্প ও নগরায়নের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য সঙ্কট, মাটি ও জলদূষণ, প্লাস্টিক সঙ্কট এবং বায়ুদূষণ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। এসব জটিল ও আন্তঃসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র প্রযুক্তি বা নীতি দিয়ে সম্ভব নয়—প্রয়োজন জনসচেতনতা, সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত সামাজিক পরিবর্তন।

এখানেই পরিবেশ শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। পরিবেশ শিক্ষা কেবল পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ বা বইভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে থেমে থাকে না; বরং এটি মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দায়িত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করায়। এটি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমস্যা-সমাধানমূলক মনোভাব, নৈতিক বিবেচনা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং স্থিতিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলে। পরিবেশ শিক্ষা নাগরিকদের এমন জ্ঞান, মনোভাব ও দক্ষতা প্রদান করে, যা তাদেরকে দায়িত্বশীল আচরণে অনুপ্রাণিত করে এবং প্রাত্যহিক জীবনধারা থেকে জাতীয় নীতিনির্ধারণ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। SDG-র মূল মন্ত্র "Leave No One Behind"— অর্থাৎ কাউকে পিছনে না ফেলে উন্নয়ন—এই ধারণা বাস্তবে রূপ দিতে হলে পরিবেশগত ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা অপরিহার্য। এসব বিষয় পরিবেশ শিক্ষার কেন্দ্রে অবস্থান করে। ফলে পরিবেশ শিক্ষা ব্যক্তি পর্যায়ে "চিন্তার পরিবর্তন" বা Thinking Shift তৈরি করে—যা আচরণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে সমাজব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে।

একইসঙ্গে পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে—যা ২১শ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপরিহার্য। ব্যবসা, কৃষি, নগরায়ণ, শিল্পনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, প্রযুক্তি—সবক্ষেত্রে পরিবেশগত বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করা এখন দায়বদ্ধতার পাশাপাশি একটি অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা।

ফলস্বরূপ বলা যায়, পরিবেশ শিক্ষা শুধু শিক্ষার একটি শাখা নয়; এটি একটি সার্বিক মানবিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রক্রিয়া, যা মানুষকে প্রকৃতি ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্থিতিশীল উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে প্রস্তুত করা সম্ভব, এবং এটি SDG বাস্তবায়নের জন্য একটি অগ্রগামী, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি গড়ে দেয়।

পরিবেশ শিক্ষার ধারণা ও দর্শন:

পরিবেশ শিক্ষার ধারণা বৈশ্বিক পরিসরে গুরুত্ব পেতে শুরু করে ১৯৭০-এর দশকে, যখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশগত সংকট মোকাবিলার জন্য নতুন শিক্ষাদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। পরিবেশ দূষণ, অরন্য ধহংস ইকোসিস্টেমের ক্ষয় এবং দ্রুত শিল্পায়নের প্রভাব বুঝতে সমাজকে আরও সচেতন করার প্রয়োজনে পরিবেশ শিক্ষা এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হয়। ইউনেস্কো পরিবেশ শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছে "একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, পরিবেশগত সমস্যাবলি উপলব্ধি করে এবং সমাধান গ্রহণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মনোভাব তৈরি করে।" এই সংজ্ঞা স্পষ্ট করে যে পরিবেশ শিক্ষা কেবল তথ্য প্রদান নয়; বরং এটি সচেতনতা, বিশ্লেষণ, সমাধান উদ্ভাবন ও দায়িত্বশীল আচরণ গঠনের সমন্বিত প্রক্রিয়া।

পরিবেশ শিক্ষার দর্শন চারটি মূল উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত—জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা ও অংশগ্রহণ। প্রথমত, জ্ঞান উপাদান ব্যক্তি ও সমাজকে ইকোসিস্টেম, জলবায়ু ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য, দূষণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয়। দ্বিতীয়ত, দক্ষতা উপাদান সমস্যা বিশ্লেষণ, গবেষণা পরিচালনা, প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের মতো ব্যবহারিক ক্ষমতা গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিবেশ ন্যায়বিচার, আন্তঃপ্রজন্ম সমতা, দায়িত্ববোধ ও টেকসই জীবনধারা গ্রহণের জন্য মানবিক ও সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে। চতুর্থত, অংশগ্রহনের উপাদান ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড, নীতিনির্ধারণ এবং জনসম্পৃক্ততায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে, যা বাস্তব পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক।

সব মিলিয়ে পরিবেশ শিক্ষা কেবল পুথিঁ ভিত্তিক জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ নয়; এটি সমাজের আচরণ, মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রাকে স্থিতিশীল পথে পরিচালিত করার এক শক্তিশালী প্রক্রিয়া। তাই পরিবেশ শিক্ষা আজ একটি জীবনমুখী সামাজিক আন্দোলন—যার লক্ষ্য মানুষ, প্রকৃতি ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) বাস্তবায়নে পরিবেশ শিক্ষা একটি মৌলিক, সমন্বয়কারী ও রূপান্তরমূলক শক্তি হিসেবে কাজ করে। SDG-র প্রায় সবগুলোর সাথেই পরিবেশ শিক্ষার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত SDG 4 (মানসম্মত শিক্ষা), SDG 13 (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা), SDG 14 (সমুদ্রজীবন সংরক্ষণ) এবং SDG 15 (ভূমিজ জীববৈচিত্র্য রক্ষা)। পরিবেশ শিক্ষা শুধু পরিবেশগত জ্ঞান সরবরাহ করে না; বরং এটি সমাজে এমন চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন আনে যা স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণে অপরিহার্য।

SDG 4-এর অধীনে পরিবেশ শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ SDG 4.7-এ স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে স্থিতিশীল উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শান্তি, মানবাধিকার ও বৈশ্বিক নাগরিকত্ব বিষয়ে শেখানো আবশ্যক। পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি বাড়ায়, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং দায়িত্বশীল বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

SDG ১৩—জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা—বাস্তবে পরিবেশ শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলবায়ু বিজ্ঞান, অভিযোজন কৌশল, শক্তি-সাশ্রয়ী জীবনধারা ও দূষণ কমানোর উপায় সম্পর্কে সচেতনতা মানুষকে আচরণগতভাবে পরিবর্তিত করে। এর ফলে জরুরি অবস্থায় প্রস্তুতি সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নবায়নযোগ্য শক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং নীতিনির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ জোরদার হয়।

SDG 14 ও 15 এর লক্ষ্য—সমুদ্রজীবন এবং ভূমিজ জীববৈচিত্র্য রক্ষা—পরিবেশ শিক্ষা ছাড়া অসম্পূর্ণ। পরিবেশ শিক্ষা নাগরিকদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতন করে, নদী ও সাগর বর্জ্য কমাতে অনুপ্রাণিত করে, বন সংরক্ষণ ও পুনর্বনায়নে কমিউনিটি অংশগ্রহণ বাড়ায় এবং কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশীল চর্চা যেমন অর্গানিক কৃষি বা সমন্বিত পোকা ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে।

এছাড়া SDG 6 (বিশুদ্ধজল), SDG 7 (পরিষ্কার শক্তি), SDG 11 (স্থিতিশীল নগরায়ণ) এবং SDG 12 (দায়িত্বশীল উৎপাদন ও ভোগ) বাস্তবায়নেও পরিবেশ শিক্ষা অপরিহার্য। এটি জল ও শক্তি সাশ্রয়ী আচরণ গড়ে তোলে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে, সবুজ নগর উন্নয়নে মানুষকে সম্পৃক্ত করে এবং দায়িত্বশীল ভোক্তা আচরণ প্রচার করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পরিবেশ শিক্ষা SDG বাস্তবায়নের কেন্দ্রে অবস্থান করে। এটি জ্ঞান, নৈতিকতা, দক্ষতা ও নাগরিক অংশগ্রহণকে একত্রিত করে এমন এক সমাজ নির্মাণ করে, যা পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সক্ষম। তাই পরিবেশ শিক্ষা হল স্থিতিশীল উন্নয়নের এক অনিবার্য ও শক্তিশালী চালিকা শক্তি।

পরিবেশ শিক্ষা, আচরণগত পরিবর্তন ও সামাজিক রূপান্তর:

পরিবেশ শিক্ষা মানবসমাজের ভাবনা, মূল্যবোধ এবং আচরণের ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করে। এটি কেবল তথ্য বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সরবরাহের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক, দায়িত্বশীল ও স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, যা দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করে। যখন পরিবেশগত জ্ঞান ব্যক্তি পর্যায়ে অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তা জীবনধারার প্রতিটি স্তরে আচরণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত অভ্যাস থেকে শুরু করে পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক পর্যায়—সকল ক্ষেত্রেই পরিবেশ শিক্ষা মানুষের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডকে নতুনভাবে পরিচালিত করে।

গবেষণা নির্দেশ করে যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন মানুষ সাধারণত বর্জ্য উৎপাদন কমাতে সচেষ্ট হয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব পণ্য নির্বাচন করে, অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় কমিয়ে আনে এবং চারপাশে সবুজায়ন বাড়াতে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশ নেয়। এছাড়াও তারা কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে পরিবহন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনে—যেমন হাঁটা, সাইকেল ব্যবহার, বা গণপরিবহন বেছে নেওয়া। এসব আচরণ কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং এটি পরিবারের অন্য সদস্যদেরও প্রভাবিত করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়। ফলে একটি ছোট পরিবর্তন ধীরে ধীরে সমষ্টিগত চর্চায় রূপান্তরিত হতে থাকে।

পরিবেশ শিক্ষা নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্বশীলতা শক্তিশালী করে, যার ফলে তারা জলবায়ু ন্যায়বিচার, পরিবেশ সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। তারা পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নাগরিক উদ্যোগ, সচেতনতা প্রচার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার-সমতাভিত্তিক পরিবেশ আন্দোলন বা জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। পরিবেশ সচেতন নাগরিকেরা কেবল নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করেন না; বরং তারা অন্যদের অনুপ্রাণিত করেন, দল গঠন করেন, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন যাতে পরিবেশবান্ধব সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়।

অন্যদিকে, পরিবেশ শিক্ষা উপভোক্তা আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান পরিকল্পনা, পরিবহন চাহিদা, বর্জ্য ফেলার পদ্ধতি এবং শক্তি ব্যবহারের অভ্যাসকেও প্রভাবিত করে। মানুষের মধ্যে যখন উৎপাদন ও ভোগের সম্পর্ক, পরিবেশগত ক্ষতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, তখন তারা দায়িত্বশীল ভোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠেন। এটি অর্থনীতি ও শিল্পনীতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, কারণ স্থিতিশীল পণ্যের চাহিদা বাড়লে ব্যবসাগুলোও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে এগিয়ে আসে।

এইভাবে, ব্যক্তি পর্যায়ের আচরণগত পরিবর্তন থেকে শুরু করে সামাজিক আন্দোলন এবং নীতিগত পরিবর্তনের সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক স্থিতিশীল সংস্কৃতি (Sustainability Culture) গড়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি সমাজকে এমন একটি পথের দিকে পরিচালিত করে, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ, সম্পদের সুষম ব্যবহার, ন্যায়সংগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকে মানবজীবনের মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে পরিবেশ শিক্ষা কেবল আচরণ বদলায় না; এটি সমাজকে নতুনভাবে চিন্তা করতে শেখায়, ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে এবং সমগ্র মানবসমাজকে একটি স্থিতিশীল, সমতাভিত্তিক ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশ শিক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জ:

পরিবেশ শিক্ষা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নে বহু জটিল বাধা বিদ্যমান। পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—সবগুলো ক্ষেত্রে একাধিক সীমাবদ্ধতা পরিবেশ শিক্ষার বিস্তারকে ব্যাহত করে। এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও সমাধান প্রস্তাব করা ভবিষ্যতের স্থিতিশীল শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ্যক্রমের অপর্যাপ্ততা: বর্তমান পাঠ্যক্রমে পরিবেশবিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা প্রায়ই তাত্ত্বিক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। বই কেন্দ্রীক পাঠদান পদ্ধতিতে পরিবেশগত সমস্যা, স্থানীয় প্রেক্ষাপট, বাস্তব অভিজ্ঞতা বা মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পরিবেশগত সংকটের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা পেলেও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, সমস্যা-সমাধানমূলক চিন্তা, গবেষণাভিত্তিক কাজ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিবেশ শিক্ষার কার্যকরতা কমিয়ে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু তথ্য জানে, কিন্তু সেই তথ্য ব্যবহার করে বাস্তব পরিস্থিতিতে কীভাবে উদ্যোগ নিতে হয়—তা পুরোপুরি শিখতে পারে না।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি: পরিবেশ শিক্ষা একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা ইকোলজি, জলবায়ুবিজ্ঞান, ভূগোল, প্রযুক্তি, নীতিনির্ধারণ, সামাজিক বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয় দাবি করে। এই ধরনের শিক্ষা প্রদান করতে শিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণ, গবেষণা পদ্ধতির জ্ঞান, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশগত মডেলিং ও ফিল্ডওয়ার্কের দক্ষতা থাকতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক শিক্ষক এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত, এবং পরিবেশ শিক্ষার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা পাঠদানের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রায়ই অপর্যাপ্ত থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশ শিক্ষার পূর্ণ সম্ভাবনা পৌঁছায় না।

প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তির সীমাবদ্ধতা: পরিবেশ শিক্ষা এখন প্রযুক্তি-নির্ভর একটি ক্ষেত্র। ডিজিটাল ল্যাব, ওয়েদার সিমুলেশন, মোবাইল অ্যাপ, ড্রোন, রিমোট সেন্সিং এবং GIS (Geographic Information Systems) পরিবেশ অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ টুল। কিন্তু অনেক বিদ্যালয় ও কলেজে এসব প্রযুক্তিগত সুবিধা নেই। দূরবর্তী ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের অভাব আরও প্রকট। ইন্টারনেট সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভার্চুয়াল ফিল্ড ট্যুর বা শিক্ষণ সফটওয়্যার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা পরিবেশ শিক্ষাকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। প্রযুক্তি ছাড়া পরিবেশগত পরিবর্তন, জলবায়ু ঝুঁকি বা স্থানীয় ইকোসিস্টেম বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা: পরিবেশ শিক্ষার কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত বিশ্বাস ও জীবনধারার ওপর। অনেক সমাজে পরিবেশবান্ধব আচরণ যেমন—বর্জ্য পৃথককরণ, প্লাস্টিক কম ব্যবহার, গাছ লাগানো, পানিসাশ্রয়—এগুলোকে এখনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরিবারের অভ্যাস, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে ভুল ধারণা শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারে যদি বিদ্যুৎ অপচয় কমানোকে গুরুত্ব না দেয়, তবে শিক্ষার্থীর শেখা পরিবেশবান্ধব আচরণ টিকেই থাকে না। শহুরে ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশেই সামাজিক বাবা-মা, প্রতিবেশী, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির প্রভাব আচরণগত ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে পরিবেশ শিক্ষার ভূমিকা

২১শ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে পরিবেশ শিক্ষা শুধু বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নয়, ভবিষ্যতের স্থিতিশীল মানবসভ্যতা নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, কৃষি, নগরায়ণ ও সামাজিক কাঠামো—সবক্ষেত্রেই যে দ্রুত রূপান্তর ঘটছে, তা পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বকে আরও বিস্তৃত করে তুলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), স্মার্ট কৃষি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং স্মার্ট সিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন মডেল বিশ্বকে নতুন পথে এগিয়ে নিচ্ছে। এই উদ্ভাবনগুলোকে স্থিতিশীলভাবে ব্যবহার করতে হলে পরিবেশ শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর, গবেষণাধর্মী এবং বাস্তবমুখী হতে হবে।

AI ও ডেটা অ্যানালিটিক্স পরিবেশগত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস, বন্যা-খরা মডেলিং, দূষণ পর্যবেক্ষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব আধুনিক টুল কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, পরিবেশগত বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য। ভবিষ্যতের পরিবেশ শিক্ষা তাই শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধারণা নয়; বরং প্রযুক্তি-সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকাশের পরিপূর্ণ একটি ব্যবস্থা হয়ে উঠবে।

স্মার্ট কৃষি ও নবায়নযোগ্য শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে পরিবেশ শিক্ষা আরও অপরিহার্য। স্মার্ট কৃষির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা, অ্যাপ-ভিত্তিক চাষাবাদ, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ এবং ফসলের পূর্বাভাস সম্ভব হচ্ছে। এগুলো শেখানো না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যনিরাপত্তায় স্থিতিশীল মডেল গড়ে তুলতে পারবে না। একইভাবে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস এবং সবুজ প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে।

স্মার্ট সিটি ধারণা আগামী দিনের নগর উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হবে, যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাধার সংরক্ষণ, সবুজ অবকাঠামো, গণপরিবহন উন্নয়ন এবং শক্তি-সাশ্রয়ী নগরব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এসব ধারণা বাস্তবায়নে নাগরিকদের পরিবেশবান্ধব মনোভাব, প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা ও নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা অপরিহার্য—যা পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

গবেষণার তথ্য বলছে যে পরিবেশ শিক্ষাসমৃদ্ধ সমাজ অধিকতর স্থিতিশীল, পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলায় দক্ষ, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম। পরিবেশ–সচেতন জনগোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পদ অপচয় কমায়, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ায়, দায়িত্বশীল ভোগবাদ গ্রহণ করে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও প্রজন্মগত সাম্যের ভিত্তিতে উন্নয়নের কাঠামো তৈরি করে। ফলে পরিবেশ শিক্ষা কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা নয়; বরং সমগ্র সমাজকে দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সহনশীল ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে।

সব মিলিয়ে, পরিবেশ শিক্ষা ভবিষ্যতের স্থিতিশীল মানবসভ্যতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এটি এমন এক শক্তি, যা প্রযুক্তি, সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধকে এক সুতোয় গেঁথে মানবজাতিকে একটি নিরাপদ, ন্যায়সংগত ও টেকসই ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত করবে। তাই ভবিষ্যতের উন্নয়ন কাঠামো যতই আধুনিক হোক না কেন, পরিবেশ শিক্ষা থাকবে তার মূল প্রেরণা ও চালিকা শক্তি হিসেবে।

উপসংহার:

SDG বাস্তবায়ন একটি বহুমাত্রিক ও বৈশ্বিক প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র নীতি বা প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে না; বরং সচেতন নাগরিক সমাজ, বৈজ্ঞানিক মনোভাব, স্থিতিশীল মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীল আচরণই এর প্রকৃত ভিত্তি। এই মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন গড়ে তুলতে পরিবেশ শিক্ষা অনন্য এবং অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে, নৈতিকতা শেখায়, দক্ষতা গড়ে তোলে, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং সমাজকে টেকসই উন্নয়নের পথে চালিত করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় উভয়ই সমস্যা চিহ্নিত, সমাধান উদ্ভাবন এবং টেকসই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। অতএব বলা যায়, পরিবেশ শিক্ষা ভবিষ্যৎ পৃথিবী রক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী এবং কার্যকর চালিকা শক্তি—যা SDG বাস্তবায়নের ভিত্তি ও পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

পুস্তক ও প্রবন্ধ:

- চক্রবর্তী, আশিষ (২০১৯). *পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা.* কলকাতা: প্রগতিশীল পাবলিশার্স।– পরিবেশ শিক্ষার ধারণা, বিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছে।
- মুখোপাধ্যায়, মনোজ (২০২১).স্থিতিশীল *উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। – এসডিজির কাঠামো এবং পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
- দত্ত, রিজিয়া (২০২০). "পরিবেশ শিক্ষা ও স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিত," *পরিবেশ চেতনা,* ১৫(২), ৪৫–৫৬।– শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশবান্ধব আচরণ গঠনে পরিবেশ শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করেছে।

- রায়, অনির্বাণ (২০১৮). “এসডিজি বাস্তবায়নে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা,” *ভারতী শিক্ষা জার্নাল*, ১২(১), ৬০–৬৮। – শিক্ষার মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।
- সেনগুপ্ত, শ্রাবন্তী (২০২২). *পরিবেশ, মানুষ ও উন্নয়ন*. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী প্রকাশনী। – মানবউন্নয়ন, পরিবেশ সংকট ও শিক্ষা-নীতির আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরে এসডিজির সঙ্গে যুক্ত করেছে।
- গুরুং, শঙ্কর (২০২০). “স্কুল পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন,” *শিক্ষা অন্বেষণ*, ৯(৩), ৩০–৪২। বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিবেশ শিক্ষা কীভাবে স্থিতিশীল চিন্তাভাবনা গড়ে তোলে তা দেখানো হয়েছে।
- বিশ্বভারতী পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্র (২০২১). স্থিতিশীল *উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভারত*. – জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ।
- চৌধুরী, সৌম্য (২০২৩). “এসডিজি-৪ ও পরিবেশ শিক্ষা: নতুন শিক্ষানীতির আলোকে,” *বঙ্গ শিক্ষা*, ১৮(১), ৭৫–৮৪। – শিক্ষার গুণগত মান ও পরিবেশ শিক্ষাকে এসডিজি ৪-এর উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা।

Citation: **Nandi. M.,** (2025) “পরিবেশ শিক্ষা: এসডিজি বাস্তবায়নের শক্তিশালী চালিকা শক্তি”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-08, August-2025.